দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ....27 APR 2017
পৃঃ ...৮... কলাম..... ২ ......

ড. এম. এম. আকাশ

শিক্ষা ব্যবস্থা ও আমাদের করণীয়

শিক্ষাখাতে আমাদের প্রত্যাশিত মাত্রার বাজেট আমরা পাচ্ছি না। যেখানে আদর্শ অনুপাতটি হচ্ছে জি.ডি.পি-র ৬ শতাংশ, সেখানে সেটি কমতে কমতে ১.৯ শতাংশে এসে ঠেকেছে। আমাদের শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়াতে হবে এবং ঐ বর্ধিত অঙ্ক মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান ও পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করতে হবে

বর্তমানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজের শ্রেণিভেদকে শুধু মেনেই নেয়নি তাকে ক্রমাগত বৃদ্ধি করে চলেছে। এ অর্থে এটি আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে সাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বাংলাদেশে এখন তিন ধারার শিক্ষা বিদ্যমান।

প্রথম ধারাটি বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছে। মূলত সরকারি-বেসরকারি খাতে নিম্ন বেতন বা মাঝারি বেতনের বিনিময়ে, মূলধারার পাঠক্রম অনুসারে প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত এই শিক্ষা কার্যক্রম বিস্তৃত। এটা মূলত দেশের মধ্যস্তরের জনগণকে শিক্ষিত করে তুলছে। এরা তুলনামূলকভাবে কম বিদেশমুখী, কম বিজাতীয় সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট এবং ধর্মপরায়ণ হলেও ধর্ম গোঁড়া বা মৌলবাদী নয়। তবে কারো কারো মতে, মধ্যবিত্তদের মধ্যেও বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতার দ্রুত প্রসার ঘটছে। সম্ভবত বৈশ্বিক পরিস্থিতি ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনীতির নানা সীমাবদ্ধতা ও ব্যর্থতাই এর জন্য দায়ী।

দ্বিতীয় ধারাটি মোটামুটি উচ্চবিত্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এরা ইংরেজি মাধ্যমে, উচ্চ বেতনের ভিত্তিতে দেশি-বিদেশি ব্যক্তিখাত পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিচিত্র ও ভিন্ন ভিন্ন পাঠক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা অর্জন করছেন। এরা অনেক বেশি বিদেশমুখী এবং বিজাতীয় সংস্কৃতির ভক্ত। বর্তমানে এসব প্রতিষ্ঠানের ধনী উচ্চবিত্ত, উচ্চশিক্ষিত ছাত্রদের মধ্যে একধরনের আত্মপরিচয় সংকট (Identity Crisis) তৈরি হচ্ছে। ফলে এদের মধ্যে কেউ কেউ ইন্টারনেট, বৈশ্বিক প্রচারণা, মৌলবাদী রাজনীতি ইত্যাদির সহজ শিকারে পরিণত হচ্ছেন। ফলে প্রথমে ধর্মপরায়ণ পরে মৌলবাদী এবং অবশেষে নিষ্ঠুর জঙ্গিতে পরিণত হওয়ার ব্যতিক্রমী প্রবণতাও এদের সন্তানদের মধ্যে সম্প্রতি অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা দিচ্ছে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় তৃতীয় ধারাটি হচ্ছে ধর্মীয় শিক্ষার ধারা। এটি আবার দুটি উপধারায় বিভক্ত—আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমী মাদ্রাসা। আলিয়া মাদ্রাসা সরকারের আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করে বিধায় সেখানে সরকারি জাতীয় পাঠক্রমের একটি ভূমিকা এবং কিছুটা সরকারি নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান। কিন্তু কওমী মাদ্রাসার উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ খুবই কম। এসব মাদ্রাসায় এখন পর্যন্ত গ্রামীণ দরিদ্র পিতামাতাদের সন্তান-সন্ততিই বেশি।

এ কথা সহজেই অনুমেয় যে আমরা যদি বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভবিষ্যৎ নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলতে চাই তাহলে আমাদের এই তিন ধারার শিক্ষাকে ক্রমে ক্রমে একটি মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে। তার অর্থ এই নয় যে, বাংলা মাধ্যম মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়া অন্য সব ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো রাতারাতি বন্ধ করে দিতে হবে। এর জন্য যেটা দেখা দরকার তা হলো- মূলধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিমাণ গুণ, মান ও পাঠক্রম যাতে আরো বিকশিত হয়। এখানে সরকারি নীতি, বাজেট ব্যয়, পৃষ্ঠপোষকতার ধরন, এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করছে। ১৯৯০-২০১৪ কাল পর্বে মাধ্যমিক ও পরবর্তী পর্যায়ে মাদ্রাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৫১৫ শতাংশ। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১২৪৬ শতাংশ। ২০১৪ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৯৩৪১টি এবং সেখানে অধ্যয়নরত ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৩৫ লক্ষ ৬ হাজার ৩৮৩ জন।

পক্ষান্তরে মূলধারার মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ১৯৯০-২০১৪ কাল পর্বে প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র ২৩৯ শতাংশ এবং ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির হারও ছিল অনেক কম মাত্র ৫৭৭ শতাংশ। ২০১৪ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে স্কুলগুলোর প্রকৃত সংখ্যা হয়েছে ১৯৬৮৪টি এবং সেখানে অধ্যয়নরত ছাত্র সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯১ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৬৫ জন।

অতএব দেখা যাচ্ছে, প্রতি ২ দশমিক ১০টি স্কুলের পাশাপাশি তৈরি হয়েছে ১টি মাদ্রাসা। প্রতি আড়াইজন স্কুলছাত্রের জন্য আছে একজন সমপর্যায়ের মাদ্রাসা ছাত্র। সুতরাং নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, স্কুল বা মাধ্যমিক পর্যায়ে মাদ্রাসা ভিত্তিক শিক্ষা এখন এক তৃতীয়াংশের বেশি গুরুত্ব অর্জন করে ফেলেছে। আমরা দেখছি মাদ্রাসা শিক্ষা ১০০ ভাগ আসছে ব্যক্তি খাত থেকে। মূলধারার ক্ষেত্রেও মাধ্যমিক পর্যায়ে ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোরই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিদ্যমান। এই হারটি কম-বেশি ৯৭-৯৮ শতাংশের সমান!

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৭০-২০১৪ কাল পর্বে বেড়েছে ২৭৩ দশমিক ২ শতাংশ। এই সময় ছাত্রসংখ্যাও বেড়েছে ২৭৩ দশমিক ২ শতাংশ। আতঙ্কজনক যে তথ্যটি পাচ্ছি, তা হচ্ছে— ১৯৭০ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ছিল মাত্র ৯ দশমিক ২ শতাংশ। ২০১৪ সালে এই গুরুত্ব হচ্ছে ৪১ দশমিক ৯ শতাংশ। যদিও ছাত্রসংখ্যার ক্ষেত্রে ১৯৭০-এ ব্যক্তিখাতের অধীনস্থ ৯ দশমিক ২ শতাংশ প্রতিষ্ঠানে পাঠ করত ২৪ শতাংশ ছাত্র আর এখন ৪১ দশমিক ৯ শতাংশ ব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে পাঠ করছে ২৫ শতাংশ ছাত্র। সব মিলিয়ে দেখা যায়, ২০১৪ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে মোট বিদ্যালয় সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৮ হাজার ৫৩৭টি। আর ছাত্রসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ৫২ হাজার ৯৭৯ জন।

পক্ষান্তরে প্রাথমিক পর্যায়ে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠানগুলো ১৯৯৫-২০১৪ কাল পর্বে ২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এখানে ছাত্রসংখ্যাও আর বৃদ্ধি পায়নি। তারপরেও ২০১৪ সালে প্রাথমিক পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪৪১৬টি। অর্থাৎ প্রতি ২৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য রয়েছে একটি এবতেদায়ি প্রাথমিক মাদ্রাসা। অন্যদিকে ২০১৪ সালে মোট প্রাথমিক মাদ্রাসা ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ৭৬ হাজার ৩৯৮ জন। অর্থাৎ প্রতি ২৮ জন মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষার্থীর জন্য রয়েছে ১ জন এবতেদায়ি মাদ্রাসার ছাত্র। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা শিক্ষার অনুপ্রবেশের হারটি তুলনামূলকভাবে অনেক কম। মাত্র ৪ শতাংশ বা তার চেয়েও কম। সে তুলনায় মাধ্যমিক পর্যায়ে সেই হারটি অনেক বেশি প্রায় তিন ভাগের এক ভাগ বা ৩৩ শতাংশের চেয়ে বেশি।

ব্যক্তি খাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অধিকাংশ ছাত্র পাঠ করছেন মূলত দুটি বিষয়—বিজ্ঞান এবং ব্যবসা। এই দুই বিষয়ে অধ্যয়নরত ছাত্রের অনুপাত হচ্ছে মোট ছাত্রসংখ্যার প্রায় ৭৩ শতাংশ। পক্ষান্তরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এই অনুপাতে অনেক কম—প্রায় ৪০ শতাংশ। সহজেই বোঝা যায় যে, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আসলে কোনো ভারসাম্যমূলক বিদ্যা প্রদান করতে সক্ষম হচ্ছে না।

১৯৭০-২০১৪ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যা বেড়েছে ১২৬৬ শতাংশ। ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে ১০০৪ শতাংশ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, হু-হু করে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রসার ঘটছে। অবশ্য সেই সঙ্গে প্রসার ঘটছে উচ্চ শিক্ষিত বেকারের হার। দেখা যাচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষিতদের মধ্যে বর্তমানে বেকারত্বের হার সর্বাধিক প্রায় ১৭ শতাংশ। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে সংখ্যার বিচারে এখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব মাত্র ৩০ শতাংশ। ৭০ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ই হচ্ছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়।

উপরিউক্ত তথ্যাবলীর একটি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে—এ শুধু পরিমাণগত হ্রাস বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করেছে। তবু এ থেকেও আমরা বুঝতে পারি যে 'মাধ্যমিক' পর্যায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে অবিলম্বে আমাদের মূলধারার বিদ্যালয় সংখ্যা বাড়াতে হবে। এটি আমাদের জরুরি একটি কাজ।

দ্বিতীয়ত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা খুবই অবহেলিত হচ্ছে। সে ক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করা ছাড়া এ ক্ষেত্রে আমরা যথার্থ মানুষ তৈরি করতে পারবো না। ব্যক্তি খাতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য গবেষণা ও মেধাভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

আরো তিনটি সাধারণ সমস্যার কথা এখানে বলা দরকার। সকল স্তরেই শিক্ষার গুণগত মান ক্রমহ্রাসমান। প্রাথমিক শিক্ষায় পরিমাণগত বিস্তৃতি হয়েছে কিন্তু গুণগত মান বাড়েনি। এর প্রবাহমান প্রভাব উচ্চতর স্তরেও এসে জমা হচ্ছে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাড়া সর্বত্রই গুণগত মান নিয়ে অজস্র অভিযোগ রয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ এবং সে জন্য শিক্ষা খাতে উপযুক্ত সুশাসন ও প্রণোদনা কাঠামো প্রবর্তন। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আর্থিক ঘাটতির কারণে বর্তমানে আবাসিক সমস্যা খুবই প্রকট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি থাকার ও পড়ার জন্য ন্যূনতম সুবিধা না পেয়ে প্রথম বর্ষের ছাত্ররা এখানে অমানবিক জীবনযাপন করছেন। গণরুমে আশ্রয় নিয়ে অপছন্দীয় ছাত্র রাজনীতি করে তাদের রাজনীতি বিমুখতা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাকে প্রথম বর্ষের এক ছাত্র পরামর্শ দিয়েছে মাত্র ১২ কোটি টাকা দিলে প্রথম বর্ষের আবাসন প্রত্যাশী ছয় হাজার ছাত্রের প্রত্যেককে মাসিক ১৬৬৬ টাকা করে দেওয়া যায়। তখন তারা নিজেরাই এক বছর হলে না থেকেও পড়াশুনা চালিয়ে নিতে পারবেন। তখন গণরুমে ভিত্তিক ব্ল্যাকমেইলের ছাত্র রাজনীতিও বন্ধ হয়ে যাবে। আর এটা না করলে অথবা নতুন হল নির্মাণ না করলে প্রথম বর্ষের ছাত্রটির জীবনে সবচেয়ে খারাপ রাতটি হবে তার বিশ্ববিদ্যালয় গণরুমের প্রথম রাত।

এই মর্মান্তিক আবাসন সমস্যার সমাধান না করে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষার মান বাড়াতে পারবো বলে মনে হয় না।

সবশেষে বলতে হয়, শিক্ষাখাতে আমাদের প্রত্যাশিত মাত্রার বাজেট আমরা পাচ্ছি না। যেখানে আদর্শ অনুপাতটি হচ্ছে জি.ডি.পি-র ৬ শতাংশ, সেখানে সেটি কমতে কমতে ১.৯ শতাংশে এসে ঠেকেছে। আমাদের শিক্ষা খাতে বাজেট বাড়াতে হবে এবং ঐ বর্ধিত অঙ্ক মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মান ও পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য ব্যয় করতে হবে।

মাদ্রাসা শিক্ষার উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে। ইংরেজি মাধ্যম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ও দারুণভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে, [illegible] আমাদের শিক্ষার মান [illegible] পেয়েছে। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই [illegible] করণীয়গুলোও করতে ব্যর্থ হচ্ছি। [illegible] অমানবিক সব সংকট ঘনীভূত হচ্ছে। [illegible] ঠিক প্রাথমিক শিক্ষায় [illegible] অর্জিত হয়েছে। কিন্তু এও আমাদের স্বীকার করতে হবে যে এই পরিমাণগত [illegible] সঙ্গে সঙ্গে আমরা উপযুক্ত গুণগত মান নিশ্চিত [illegible]নি। এ ঘাটতি শুধু দক্ষতার ক্ষেত্রে নয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার তথা উচ্চ শিক্ষা ও উন্নত [illegible] অর্জনের ক্ষেত্রেও তা বিদ্যমান। আমরা ইতিবাচক সংস্কারের বদলে [illegible] ধরেছি।

ব্যানবেইস
স্বাক্ষর

● লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়